শিক্ষা সমাজ দেশ

শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন হোক দূরদৃষ্টির আলোকে

–ড. হাসনান আহমেদ

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকেই বেশ কয়েকবার পাঠ্যক্রম পরিবর্তন হতে দেখলাম। আবারও পরিবর্তন শুরু হয়েছে শুনছি। পাঠ্যক্রম যখন তৈরি হয়, প্রণেতারা অনেক ভালো ভালো কথা বলেন; শুনতে বেশ ভালই লাগে। যেন গাছে-পাকা হালকা-লাল রঙের টসটসে আম উদ্দাম বাতাসের দোলায় দোল খাচ্ছে; মনে হয়, এই বুঝি পড়লো! কুড়িয়ে পাওয়ামাত্র রসনা তৃপ্ত করবো। কিন্তু কপালের ফের, বাতাসে 'নড়ে বড়োসড়ো, বোঁটা শক্ত বড়ো'। রসনা তৃপ্ত আর হয় না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। কখনো আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। শিক্ষা-উন্নয়ন প্রজেক্টের নামে সরকারের বাজেট বড়; বরাদ্দকৃত সব টাকাই বারবার শেষ হয়ে যায়। বাস্তবে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা এ জনমে আর হয়ে জুটলো না। এখন আমার এক পা কবরে। দেশের জন্য উপযোগী শিক্ষা কাঠামো, সিলেবাস তৈরি, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন পদ্ধতি, উপযুক্ত বাস্তবায়ন, শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান দেখে মরার সৌভাগ্য আর হলো না! রবি ঠাকুরের কোনো এক ছোটগল্পে 'পাগলা মেহের' নামে একটা চরিত্র ছিল। কথায় কথায় সে বলতো, 'বিলকুল ঝুট হ্যায়, বিলকুল ঝুট হ্যায়'। এদেশের অনেক কাজকর্মে আমারও তা-ই ভাবতে ইচ্ছে হয়।

পত্রিকায় পড়লাম, এবার স্কুল ও কলেজের সিলেবাসে এদেশের স্বাধীনতায় যাদের যে অবদান, ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে রচিত হবে। শুনে বেশ ভালো লাগলো। আমার ভাবনা অন্য জায়গায়। ইতিহাস যত সুন্দর করেই বিদ্যাবুদ্ধি খাটিয়ে ভারসাম্যপূর্ণভাবে রচিত হোক না কেন, তাতে শিক্ষার মান আদৌ বাড়ে কী? যার শিক্ষা নেওয়ার কথা, সে যদি শিক্ষা না নিয়ে নোটবই মুখস্ত করার তালিম নেয়? শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশনি করে মুখস্ত করতে সহযোগিতা করে। পরীক্ষাও শেষ, মুখস্ত-করা মন্ত্রও স্মৃতির অতলান্তে হারিয়ে যাওয়া শেষ, লাভ কী? অধিকাংশ স্কুল-কলেজে শিক্ষার নামে ফাঁকিবাজি। শিক্ষা মানে তো শুধু লেখা আর পড়া না– ছাত্রছাত্রীদের বাকি জীবনটা কিভাবে পরিচালিত হবে তার একটা সাধারণ প্রস্তুতি। তারপর বিশেষায়িত জ্ঞানার্জন। প্রত্যেক শ্রেণিতে কি কি বিষয় শিখতে হবে তা আগে সাজাতে হয়। তারপর পঠিত বিষয়গুলো বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বণ্টন করতে হয়। এই পঠিত বিষয়গুলোর মধ্যে কতটুকু নমনীয়তা থাকলো, তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। অথচ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তত মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত কোনো নমনীয়তা নেই। অন্য কোনো-না-কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কপি ও পেষ্ট করে বাংলাদেশিদের জন্য পাঠ্যসূচি তৈরি। শিক্ষার্থী বাংলা-ইংরেজি কোনোটাই ভালো জানে না। শিক্ষা শুধু চাকরি পাওয়ার জন্য নয়; শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত জাতি ও জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠে। বিদ্যাশক্তি জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে। এভাবে কপি-পেস্ট সিলেবাস তৈরি করলে আত্মমর্যাদাশীল, স্বকীয় সত্তাবিশিষ্ট কোনো জাতি কোনো দিনই গড়ে উঠবে না, যদিও আমরা তা চাই।

আমার বাসায় ইলেকট্রিক স্যুইচ টিপি দেয়ালের এক কোনে, বাতি জ্বলে ও ফ্যান ঘোরে দশ হাত দূরে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সে দর্শন কই? শিক্ষার মধ্যে বাংলাদেশিদের সংস্কৃতি, দেশপ্রেম, সামাজিক বুনন, দেশীয় মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে এবং প্রতিটা শ্রেণিতেই সামগ্রীক শিক্ষার মধ্যে জীবনমুখী শিক্ষা, মনুষ্যত্ববোধ-সঞ্চারক শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষা শেখাতে হবে। এসব বিষয় বিবেচনায় আনা হচ্ছে কিনা? পাঠ্যক্রম তৈরির সময় এদেশের বাস্তব অবস্থাকে বিবেচনায় না আনলে আবার পিছিয়ে যেতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্যে যদি আমাদের জনগোষ্ঠীকে অন্য কোনো সম্প্রসারণবাদী গোষ্ঠীর নিগড়ে বাঁধার স্বপ্ন লুকিয়ে থাকে, তবে বাংলাদেশিরা কোনোদিনই নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না, বিশ্বসভায় নিজেদের অস্তিত্বকে জানান দিতে পারবে না। অন্য জাতির গোলামি করে খাবে। পরবর্তীতে অন্য কোনো ভিন্নধর্মী গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে মিশেও যেতে পারে।

নৈতিক মূল্যবোধ আমাদের সমাজের মানুষের মধ্যে কতটুকু আছে, তা মোটামুটি সবারই জানা। সে বিষয়ের কোনো উন্নতি না করতে পারলে দেশের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাবে। শুধু দেশ সংস্কারে কোনো কাজ হবে না। এই তেপ্পান্ন বছরে দুর্নীতির 'জোয়ার' বয়ে যেতে দেখলাম, পরবর্তীতে যে দুর্নীতির 'সুনামি' বয়ে যাবে না এবং ভিনদেশি শোষণ আরো বাড়বে না– এর নিশ্চয়তা কোথায়? এ থেকে বেরিয়ে আসার একটাই উপায়, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। আমার গবেষণা মতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়ন ও মান সামাজিক শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল। আবার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাব সামাজিক শিক্ষার ওপর পড়ে। দুটো চলকের মধ্যে পারস্পরিক ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। আমাদের দেশে দুটো চলকের মানই নিম্নমুখী। তাই একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার উন্নতি আশা করা বৃথা। পারস্পরিক এ দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসা অতটা সহজ নয়। সেজন্য পাঠ্যক্রম প্রণেতারা এসব বিষয়ে সতর্ক না থাকলে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ না করলে অতীতের ফলের মতোই কর্ম বৃথা হবে।

এদেশে মাদ্রাসা ও স্কুল নির্বিশেষে 'ইন্টিগ্রেরেড এজুকেশন পদ্ধতি' চালু করা প্রয়োজন। এতে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরাও বিজ্ঞান ও ব্যবসায় বিষয় পড়তে বাধ্য হবে। যে কোনো সরকার ইচ্ছে করলে আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসায় কোরআন-হাদিসের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে দিতে পারে। আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসায় অনেক প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী আমি দেখেছি। তাদের সীমাহীন প্রতিভা অকালেই ঝরে যাচ্ছে। আমি ৫২টি মুসলিম দেশের খবর রাখি, আমাদের দেশের মাদ্রাসার লেখাপড়ার মতো একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা সেখানে নেই। সেখানে মাদ্রাসায় পড়েই বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সমাজবিজ্ঞানী, হিসাববিদ, পদার্থবিজ্ঞানী, কৃষিবিদ হচ্ছে। জনশক্তির একটা অংশকে উৎপাদনমুখী না করা আমাদের সামগ্রীক ব্যর্থতা। মাদ্রাসার ক্ষেত্রে একথা বেশি প্রযোজ্য। প্রযুক্তির এই যুগে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় বিষয় না পড়ে বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় জাতি হিসেবে টিকে থাকা কঠিন। এ বোধটুকু আমাদের জন্মাতে হবে। শুধু বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষায় গেলেই যে সব কিছু অর্জন হয়ে যাবে তা নয়। কারণ সাধারণ স্কুল-কলেজের সামগ্রিক শিক্ষার মানও তো নীচু। 'ইন্টিগ্রেরেড এজুকেশন পদ্ধতি' চালুর সাথে সাথে শিক্ষার মান বাড়ানোর কৌশল বের করতে হবে। নোট মুখস্ত করিয়ে সার্টিফিকেট হাতে ধরিয়ে দিলেই শিক্ষা হয় না। আমি তো ছাত্রছাত্রীদের কৃতকর্ম নিয়েই জীবন কাটাচ্ছি। বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা না জানে পড়তে, না জানে লিখতে, না জানে চিন্তা করতে। অথচ এ দুর্বল ভিত নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। নোট মুখস্ত করতে দিলে ভালো করে, কিন্তু মেধার বিকাশ ঘটাতে দিলেই যত সমস্যা। না আছে ভাষাজ্ঞান, না আছে এ্যানালাইটিক্যাল এ্যাবিলিটি, প্রবলেম সলভিং ক্যাপাসিটি। সেজন্য প্রথম শ্রেণি থেকেই যত লেখাপড়াই করুক, নোট-গাইড মুখস্ত করুক, পাঠ্য বিষয়ে মেধা খাটানোর ব্যবস্থা, পঠিত বিষয় নিয়ে মেধা বিকাশের চর্চা না করা পর্যন্ত শিক্ষার মান বাড়বে না। পাঠ্য প্রসঙ্গ নিয়ে যত ভাববে, মেধার বিকাশ তত হবে। এসব করতে মানসম্মত শিক্ষকও প্রয়োজন। ভালো শিক্ষক পেতে গেলে ভালো বেতন দিতে হবে। অযোগ্য শিক্ষকদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ছাটাই করতে হবে। প্রতিটা সরকার প্রতিটা পর্যায়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক নিয়ে দলবাজি করবে; আর শুধু পাঠ্যসূচি তৈরি করলেই শিক্ষার মান শনৈঃ শনৈঃ বেড়ে যাবে, এটা কীভাবে সম্ভব? শিক্ষাপদ্ধতি বাস্তবায়ন সমস্যা এদেশে প্রকট। যতবারই শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করতে দেখেছি, বাস্তবায়ন সমস্যার কারণে ব্যর্থ হতেও দেখেছি। অথচ বিষয়টা নিয়ে কোনো শিক্ষাবিদকে ভাবনা-চিন্তা করতে দেখিনে।

শিক্ষায় অনগ্রসরতার আরেকটা উল্লেখযোগ্য ঘুমন্ত ফ্যাক্টর: এদেশে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ৯৯.৫০ শতাংশ লোক ধার্মিক, বাকিরা কেউ সন্দিগ্ধমনা, কেউবা নাস্তিক– কেউ প্রকাশ্য, কেউ মনে মনে। এদেশে শিক্ষার্থীকেও পশ্চিমা সমাজের মতো ভোগবাদী ও সেক্যিউলার বানানোর যে অপচেষ্টা, এতে বাংলাদেশিদের লেখাপড়ায় একটা দারুণ প্রভাব ফেলছে। ধর্ম কোপাও, বিশেষ করে মুসলমান ধার্মিকদের বিরুদ্ধচারণ করা এবং তাদেরকে বিনা প্রমাণে রাজনৈতিক কারণে জঙ্গি তকমা দেওয়া শিক্ষাব্যবস্থাকে কলুষিত করে ফেলেছে। ইসলামি শিক্ষা শিখলেই, টুপি-দাড়িওয়ালা ও নামাজি লোক দেখলেই তাকে বিকৃত কোনো অভিধায় ভূষিত করা কিংবা তার প্রতি প্রতিহিংসার রং ছড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। আমরা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারছি। বিশ্বব্যাপী থিও-পলিটিক্যাল বৈষম্য চলছে, এটা যে কেউ খোলা চোখেই

দেখতে পারেন। এর ঢেউ এদেশে এসেও আছড়ে পড়েছে। এদেশে নামমাত্র মুসলমান, অথচ প্রগতিশীলতার নামে সেক্যিউলারিস্টরা সুকৌশলে এক মুসলমানের বিরুদ্ধে অন্য মুসলমানকে ব্যবহার করছে। নিজের মতবাদ পুরো সমাজে বিস্তার করতে চায়। নিজেদের মধ্যে বিভেদ, প্রতিহিংসা তৈরি করে আমাদের যারা অমঙ্গল চায়, তাদের হাতকে শক্তিশালী করছে এবং আমাদের পশ্চাদপদতার কারণ হচ্ছে। বিষয়টা গভীর চিন্তার উদ্রেক করে। শুধু ধর্মশিক্ষার নামে যারা অর্ধশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অংশ, আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ শিক্ষা যারা শিখতে ও ভাবতে অপারগ, তাদেরকে শত্রু না ভেবে বুঝিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা দিয়ে সাধারণ সমাজে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারলে জাতি লাভবান হতো। তারাও তো আমাদের ভাই। এ জন্যই 'ইন্টিগ্রেরেড এজুকেশন পদ্ধতি'-র কথা বলছিলাম। এতে কওমি শিক্ষা ছেড়ে অনেকেই সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় চলে আসতো। অথবা কওমি শিক্ষা কর্তৃপক্ষ তাদের শিক্ষার্থীদের কোরআন-হাদিস শিক্ষার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতো। এক্ষেত্রে সরকারেরও অনেক দায়িত্ব। অন্য ৫২টি মুসলিম দেশে আমরা তাই-ই দেখছি। এতে এমনকি বিভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি হতো।

দুঃখের বিষয়, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তৈরির দায়িত্ব বারবারই ভোগবাদী ও সেক্যিউলারপন্থীদের হাতে চলে যাচ্ছে। এমনকি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও ঘুরেফিরে তারাই সর্বেসর্বা কিংবা তাদের পৃষ্ঠপোষক কোনো কোনো পত্রিকা সুকৌশলে ভোগবাদী ও সেক্যিউলারপন্থীদের সাহায্য-সহযোগিতা করছে এবং ভিতরে থেকে কলকাঠি নাড়ছে; অর্থাৎ এক মুসলমান আরেক মুসলমানের শত্রু হয়ে বসে আছে। এজন্য এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে নিজস্ব স্বকীয়তা সৃষ্টি করে উন্নত জাতিতে পরিণত করার কাজ বারবার বিঘ্নিত হচ্ছে। বুঝতে হবে সেক্যিউলারপন্থী বানানোই উন্নত জাতি গড়া না। আমি সবাইকে সেক্যিউলারিস্ট না হয়ে ধর্মঅহিংস হতে বলি। ষষ্ঠ শতাব্দি থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দি পর্যন্ত মুসলমানরা বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও দর্শনের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জন করে ও বাস্তবে তা কাজে লাগিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন মুসলমানরাও শ্রেষ্ঠ জাতি হতে পারে (এবং তা হওয়াও উচিৎ)। বর্তমানে আমরা সে মনোভাব হারিয়ে ফেলেছি। মানুষ ভোগবাদ ও সেক্যিউলারপন্থী হলে শিক্ষায় মানবতাবোধ-সঞ্চারক শিক্ষা প্রদান করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তখন প্রকৃত শিক্ষা আংশিক শিক্ষায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। মনুষ্যত্বহীন মানুষ আদৌ মানুষ নয়, মানুষ নামের কলঙ্ক। মানুষের মনে মানবতাবোধ-সঞ্চারক শিক্ষা থাকলে সে ব্যক্তিকে পরিচালনার জন্য পুলিশ পাহারা আর লাগে না; মনের মধ্যে মানবতাবোধ-সঞ্চারক শিক্ষা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাকে ভালো পথে চলতে শেখায়। ধর্মচর্চা অতি পুরাতন-আদিম একটা শিক্ষা সংগঠন। বিনা দ্বিধায় প্রত্যেক ধার্মিক এ শিক্ষা মনে ধারণ করে। ফলে অপকর্ম দূরে পালাই, সমাজ ও দেশ উন্নত হতে বাধ্য হয়। ধর্মচর্চা ও ধর্মিয় নিয়মাবলী পালন অর্থ মানুষ সরল ও সঠিক পথে চলা, কুসংস্কারমুক্ত হওয়া। তা সে যে ধর্মই পালন করুক। বাস্তবে আমি দেখেছি, একজন চোর-ডাকাতও স্রষ্টার নাম স্মরণ করতে করতে তার অপকর্মে শরিক হয়, উপাসনার ঘরে চাঁদা দেয়, উপাসনাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, আবার রিপুর তাড়নায় খারাপ কাজ করে। এখনো প্রতিটা স্কুলে ১০০ নম্বরের ধর্ম শিক্ষা আছে। সেখানে জীবনে ধর্মের প্রায়োগিকতা না শিখিয়ে মুখস্ত করিয়ে বেশি নম্বর পাওয়ার একটা ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের বুঝতে হবে নিজেদের আত্মমর্যাদা নিজেরা তৈরি করতে ব্যর্থ হলে অন্য কেউ তৈরি করে দেবে না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজ কবি হতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ভুল বুঝে নিজ দেশে ফিরে এসে মাতৃভাষার সাহিত্যে মনোনিবেশ করেছিলেন।

(১৮ নভেম্বর ২০২৪ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় বাতায়ন কলামে প্রকাশিত)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web: pathorekhahasnan.com